গুলশান হামলা: নিরাপত্তা বিশ্লেষণের বহুধাবিভক্ত চরিত্র

ফায়হাম ইবনে শরীফ

১ জুলাই গুলশানের নৃশংস হত্যাকান্ডের ঘটনার পর শোলাকিয়ায় ঈদের জামাতে হামলার মতো ঘটনাও ঘটে। নিরাপত্তা, তদন্ত, সন্ত্রাস দমন ইত্যাদি নিয়ে অনেক কিছু হচ্ছে। কিন্তু জনগণের নিরাপত্তার বোধ আসার বদলে বাড়ছে অনিশ্চয়তা, আতংক আর নিরাপত্তাহীনতার বোধ। সেই ভীতিকর রাতে নিজের অভিজ্ঞতা এবং এই বিষয়ে পর্যবেক্ষণ নিয়ে এই লেখা।

জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সিএনজিতে করে ঘরে ফেরার পথে, রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাস্তায় নিরাপত্তা বাহিনীর চৌকিতে কথা হয় দায়িত্বরত সদস্যদের সাথে। লেখক সিএনজির ভেতর, বাইরে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে সিএনজির ভেতর দেখছিলেন আর কথা বলছিলেন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। বেশ কয়েক বছর ধরে সেই একই প্রশ্নের সেট–কোথায় থাকেন, কী করেন, কোথা থেকে ফিরছেন, এই এলাকায় কোথায় যাবেন? উত্তরেও সেই গৎবাঁধা ঝামেলা এড়ানো বাক্যরাশি।

লেখকের সাথে একটি ব্যাগ কাঁধ থেকে আড়াআড়ি ঝোলানো। ব্যাগের ভিতর কী? নিরাপত্তা বাহিনীর একজনের এমন প্রশ্নের উত্তরে লেখক ব্যাগ খুলে দেখাতে উদ্যত হলে অপর নিরাপত্তারক্ষী তাড়াতাড়ি সিএনজিকে এগিয়ে যেতে বলে সরে যেতে থাকেন। কিছু কথা বলার ছিল এই লেখকের, কিন্তু নিরাপত্তারক্ষীরা বরং সিএনজিচালককে আদেশের সুরে নিরাপত্তা চৌকি এলাকা ছাড়তে বললেন। দিনের জমার হিসাব আর পকেটের সঞ্চয়ী হিসাবের হিসাবরক্ষক সিএনজিচালক দ্রুত এলাকা ছাড়লেন।

গুলশান ও শোলাকিয়ায় হামলার ঘটনার পর ঢাকা শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এই জোরদার ব্যবস্থা বুঝতে পারা যাবে রাস্তায় রাস্তায় অস্ত্র হাতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ঘোরাফেরায়। প্রায় সব নিরাপত্তা চৌকিকে কেন্দ্র করেই জটলা। কারণ জটলার কেন্দ্রবিন্দুতে সন্দেহভাজন।

অবশ্য ঘরবাড়িতেও এর আঁচ লেগেছে। বাড়ির মালিকরা নিরাপত্তারক্ষীর সাহায্য নিচ্ছেন, সদর দরজা লাগিয়ে রাখছেন, সম্ভব হলে বড় ভারী তালা ঝোলাচ্ছেন, যাঁদের বাড়িতে যে ধরনের যোগাযোগ মাধ্যমের অবাধ বিচরণ আছে (রেডিও, ছাপানো পত্রিকা, টিভি, ইন্টারনেট), সেখানে চোখ রাখছেন। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের বাড়ির বাইরে অবাধ বিচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ব্যক্তিগত যানবাহনের ব্যবহার নিশ্চিত করতে চাইছেন পরিবারের কর্তারা।

নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন সরকার–নানাভাবে এমন খবর ছাপছে/প্রচার করছে সংবাদমাধ্যম। সরকারি বিভিন্ন মহলে বৈঠক চলছে। নতুন নতুন নির্দেশনা আসছে, কিভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো দৃঢ় করা যায়। আরেকটি কথা বারবার শোনা যাচ্ছে সরকারি বক্তব্যে, আইএস বা ইসলামিক স্টেট নামে পরিচিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কোনো অস্তিত্ব নেই বাংলাদেশে। তবে এটি শুধু গুলশান আর শোলাকিয়া ময়দানে হামলার পর নয়, বরং এরও বেশ আগে থেকেই জোরালোভাবে এ কথা বলছে সরকার। আর বৈশ্বিক গণমাধ্যম আর বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি দূতাবাসগুলো মূলত এই একটি বিষয়েই বারবার দ্বিমত পোষণ করে আসছে সরকারের সাথে। সেই শাহবাগ আন্দোলন থেকে সময় যত এগিয়েছে, প্রতিটি ঘটনার সাথে সাথেই তাদের দাবি, বৈশ্বিকভাবে চর্চিত সন্ত্রাসবাদের যোগাযোগ বাংলাদেশে আরো জোরালো হচ্ছে। একই সাথে বেশ কিছু দূতাবাস এ ক্ষেত্রে (বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায়) তাদের সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষা জানিয়েছে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিয়ে শাহবাগে আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে 'নানা উপায়ে' (পশ্চিমা দেশগুলোতে হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে গোলাবারুদ ব্যবহারের যে ধরন লক্ষ করা যায়, সেটা এখানে ততটা জোরালো নয়, শুধু ২০১৪ নির্বাচনের আগে-পরের সময় ছাড়া) নানা স্তরের মানুষ হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। বিশেষ শ্রেণি-পেশার পরিচয়হীন মানুষ, ব্লগার, 'সামাজিকভাবে স্বীকৃত স্বাভাবিক' যৌন চরিত্রের বাইরে চর্চিত জীবনের মানুষ, ক্ষমতা চরিত্রের দিক থেকে প্রধান ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মী, লেখক, প্রকাশক, ধর্মীয় কাজে নিযুক্ত মানুষ, নিরাপত্তা রক্ষা বাহিনীর সদস্য ও বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি–এঁরাই মূলত এইসব হামলার শিকার হয়েছেন, প্রাণ হারিয়েছেন কিংবা মারাত্মকভাবে আহত হয়েছেন। প্রথমাবস্থায় বিশেষ শ্রেণিচরিত্র হিসেবে মানুষের হত্যাকাণ্ড হলেও পরে একটা সময় আপামর মানুষও (রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ পদ বা পেশায় না থাকা মানুষ) এর শিকার হয়েছেন। আর সাম্প্রতিক সময়ে ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত পেশা, শ্রেণি, পরিবারের মানুষ এইসব হামলার লক্ষ্যবস্তু। একই সাথে হামলায় এখন পর্যন্ত যাদের জড়িত থাকার কথা শোনা যাচ্ছে/অভিযোগ উঠছে, তারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই রকম শ্রেণি, পেশা, পরিবারের সন্তান।

বিশ্ববাজারে মধ্যম আয়ের দেশ হতে, যে অর্থনৈতিক উল্লম্ফনের মাঝামাঝি অবস্থানে বাংলাদেশ রয়েছে, এটি মূলত উদার অর্থনৈতিক বাজার ব্যবস্থার একটি অনুষঙ্গ। নব্বইয়ের দশক (১৯৯০) থেকে (বার্লিন দেয়ালের পতন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন, উপসাগরীয় যুদ্ধ, হান্টিংটনের সভ্যতার সংঘাত প্রকাশ ও বাংলাদেশে সামরিক শাসনের অবসান) বাংলাদেশের শহুরে জীবন ব্যবস্থায় যে আমূল পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে, সেখানে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান, বিদেশি প্রতিষ্ঠান, বৈশ্বিক উন্নয়ন সংস্থা, গণমাধ্যমের বিকাশ 'উল্লেখযোগ্য' ভূমিকা রেখেছে। অন্যদিকে গ্রামীণ জীবনে হাইব্রিড বীজ, ক্ষুদ্রঋণ, বৈদ্যুতিক সংযোগ, যোগাযোগ মাধ্যমের সহজলভ্যতার (মোবাইল, ইন্টারনেট ও অন্যান্য) পাশাপাশি বিদেশে কর্মরত শ্রমিকরাও একইভাবে 'উল্লেখযোগ্য' ভূমিকা রেখেছেন। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে আকর বা মূলে চর্চিত জীবন/জ্ঞানের বদলে এক বৈশ্বিক কাঠামো 'জোর' করে জায়গা করে নিয়েছে। সামষ্টিক জীবনের বদলে ব্যক্তিগত জীবনকে প্রাধান্য ও উদ্‌যাপনের অনুষঙ্গ হয়ে উঠছে। মৌলিক জ্ঞান কিংবা জিজ্ঞাসার চেয়ে সমসাময়িক বৈশ্বিক সমাজে চর্চিত তথ্যই 'তত্ত্ব' হিসেবে হাজির হয়েছে। হয়তো আমাদের মতো আরো কোনো অববাহিকা একই বানের জলে ভেসেছে।

এমনি এক সময়ে বাংলাদেশে হামলার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, নিরাপত্তা বিশ্লেষক, সাংবাদিক, উন্নয়নকর্মী, ব্যবসায়ী, চাকরিজীবীদের মধ্যে যাঁরাই তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করছেন, সবাই বৈশ্বিক যোগাযোগকে গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং একই সাথে কেমন পরিবারের সন্তানরা এই কাজের সাথে জড়িত সেটিকে সামনে তুলে আনছেন। বারবার উচ্চারিত হচ্ছে পরিবার, বন্ধুবান্ধব কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার কথা; সামগ্রিকভাবে সরকারের ব্যর্থতার কথা। অবশ্য সফল সামরিক অভিযানের কথা সবাই বারবার উচ্চারণ করেছেন। বিএনপি-জামায়াত সরকারের শেষ আমলে যখন ধর্মের নামে সন্ত্রাস মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে নিয়েছিল, তখন যেমন মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা ও দরিদ্র শ্রেণির অগ্রযাত্রার কথা গুরুত্ব পেয়েছিল, এবার ঠিক

উল্টো। উচ্চবিত্ত ও তাদের জীবনব্যবস্থার অনুষঙ্গের কথা উঠে আসছে বারবার। অথচ দুইয়েরই মূল যে অসাম্যে, তা নিয়ে খুব বেশি কথা শোনা যাচ্ছে না। সেই অসাম্য বহুধাবিভক্ত শিক্ষাব্যবস্থায়, অর্থনৈতিক কাঠামোতে, সামাজিক পরিমণ্ডলে, ব্যক্তিজীবনের প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে, সে কথা বরং অনুচ্চারিতই থাকুক।

রাজনীতি বিষয়ক আলোচনায় গত শতাব্দীর বৈশ্বিক যে ঘটনাগুলো গুরুত্ব সহকারে আলোচিত–বিশ্বযুদ্ধ, বর্ণবৈষম্য, জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক সংস্থা, পশ্চিমা গণতন্ত্র, ঠাণ্ডা যুদ্ধ ও তার ফলাফল, ভারত ভাগ, সাম্রাজ্য ভেঙে জাতিরাষ্ট্রের উত্থান, লাতিন আমেরিকার বিপ্লব, অস্ত্র ব্যবসা, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, সামরিক শাসন, ব্রেটন উডস ব্যবস্থা, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ–এগুলো তারই কিছু উল্লেখযোগ্য নাম। তবে এসব কিছুর পেছনে একটি বিতর্কিত ঘটনা আলোচিত মাঠে-ময়দানে, তার নাম কূটনৈতিক যুদ্ধ। যে যুদ্ধের বলি হয়েছেন এ দেশের মহান নেতা, যে যুদ্ধে লাশের মিছিল, গণহত্যা হিসেবে স্বীকৃত না হলেও হত্যা করেছে কোটি কোটি মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। কোথায় কখন এই সব যুদ্ধ দানা বেঁধেছে, তার হিসাব রাখতে অবশ্য কোনো সংগঠন কিংবা সংস্থার প্রয়োজন নেই। সেই সব দেশের জনগণের মুখে আর সাংস্কৃতিক চর্চায় উচ্চারিত হয়েছে 'কূটনৈতিক গণহত্যা'র কথা।

এমনি এক সময়ে বাংলাদেশের চলমান ঘটনাপ্রবাহের কারণ–কোনো বিচ্ছিন্ন পারিবারিক বিষয়াদির পরম্পরা, নাকি ভিনদেশি ভাষায় সনদ বিক্রি করতে থাকা কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা কিংবা সামরিকভাবে অস্ত্র ব্যবহারের ব্যর্থতা অথবা সরকারের ইচ্ছার অভাব, সেগুলো নিয়ে খোলামেলা আলোচনাটা আরো গঠনমূলকভাবেই সবাইকে সাহায্য করবে। মূল ঘটনা কিংবা সম্ভাবনা আড়াল করে অজস্র বাক্যবাণে মানুষকে বিভ্রান্ত করে সনদ প্রাপ্তি কিংবা আস্থাভাজন হতে চাওয়ার যে সুযোগ এই ঘটনাপ্রবাহ করে দিয়েছে, সেটার প্রতি লক্ষ রাখাটাও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অংশ। সেনাবাহিনী আর নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের দিয়ে যে ছক আঁকার চেষ্টা হচ্ছে, সেখানে চিন্তা করার বিষয়, নিরাপত্তা কি শুধুই সামরিক একটি ধারণা? লড়াই কি শুধু বারুদনির্ভর অস্ত্র দিয়েই করা সম্ভব? যে মগজ ধোলাইয়ের দোষ দেওয়া হচ্ছে, আমাদের চারপাশে যাঁরা ভিন্নপথে একইভাবে নিজেদের মগজ বিক্রি করেছেন, তাঁরা কিভাবে অন্যের মগজ ধোলাইয়ের হিসাব নিচ্ছেন? কেন মধ্যপ্রাচ্যের পর হঠাৎ করেই দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশে চোখ ফেরাল আইএস, সে প্রশ্ন শোনা যায়নি। শত অনাকাঙ্ক্ষার পরও পাকিস্তানের ওপর চেপে বসেনি এই ভূত, যেখানে প্রায় প্রতিমুহূর্তেই শোনা যায় রণতূর্যের চিৎকার।

এই ঘটনাপ্রবাহকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের যোগসাজশে ঘটা কোনো অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত করলে অন্যান্য দেশের সাথে (মূলত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী) সরকারের দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় চুক্তির বাধ্যবাধকতা বাংলাদেশকে আবারও কোন দিকে হেলিয়ে দেবে তা গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে দেশের ভেতর আন্তঃরাজনৈতিক দল সম্পর্ক এ ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখছে সেটিও অগ্রগণ্য চিন্তার বিষয়। যেকোনো বিষয় নিয়ে ব্যক্তিগত মতামত চাপিয়ে দেওয়ার আগে কোনটি সামষ্টিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেই বাছবিচার আশা করা যেতে পারে, সামাজিকভাবে যোগাযোগের মধ্যে থাকা এই মানুষদের মাঝে।

ধর্মের নামে যে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেওয়ার এত আয়োজন–জিম্মি, প্রচারমাধ্যমকে ব্যবহার, ফেসবুক ভাইরাল, চায়ের কাপে ঝড়, ভয়ের সংস্কৃতি, গুজবের নিষ্কলুষ বোমা এবং সর্বোপরি সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর করে তোলার রাজনৈতিক প্রয়াসকে শুধুই বিত্তবানদের ওপর আঘাত বলা যাবে কি না সেটা সময়ের সাথে পরিষ্কার হবে। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে উদার ধর্মীয় বিকাশের এই ভূমিতে এগুলো সবই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া বাস্তবতা কি না সে আলোচনা হোক। কেন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত জাপানি ও রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান ইতালীয়দের জীবন দিতে হচ্ছে বারবার সে কথা উঠুক। এমনি 'নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি'তে কাদের ঝুলি ভরছে আর কার খালি হচ্ছে, সেই হিসাব নেওয়া হোক। সন্ত্রাসের আন্তর্জাতিক আর দেশীয় বিতর্কের ভিত্তি কি কূটনীতি নাকি গুহ্যজ্ঞান, সে সমাধান হোক। একটা মিছিল হোক, যেখানে পতাকা উঠবে সত্যের, স্লোগান হবে জিজ্ঞাসার। জাতি-শ্রেণি-ধর্ম নির্বিশেষে কে যোদ্ধা আর কে সুবিধাবাদী সেই হিসাব হোক। এই বয়সে সমাজ পাল্টে দেওয়ার স্বপ্নে বিভোর সন্তানরা যার পেছনে ছুটছেন, সেটি কি বিপ্লব নাকি প্রপঞ্চ? দেশের এতসব আলোচিত-সমালোচিত রাজনৈতিক, সামাজিক তথা অর্থনৈতিক বিষয় আলোচনায় না এনে শুধু লাশ ফেলে নিজেরা লাশ হতে এসেছিলেন এঁরা? ধর্মে যে সাম্যের কথা বলা হয়েছে সেই মানদণ্ডে রামপালের বিদ্যুৎকেন্দ্র, চা শ্রমিকদের কৃষিজমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, গৃহহীন মানুষদের বস্তি উচ্ছেদ, শিক্ষা, চিকিৎসায় অসাম্য কিংবা হাইব্রিডের নামে কৃষিতে ছড়িয়ে দেওয়া মরণব্যাধিকে এরা সমস্যা মনে করেন না কেন? প্রীতিলতা, সূর্য সেনরা যেন ম্লান হয়ে না যান, এঁদের মূর্খতায় সে চেষ্টা হোক। যে ইসলামের নামে এত আয়োজন, সেই ইসলামকে বোঝার চেষ্টা করেছেন কজন আর ব্যবসায় ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন কজন, সেই হিসাব হোক। বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদের রাজনীতিতে কার হিস্যা কতটুকু, সেটি নিয়ে আলোচনা হোক। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করা যায়, ইরাক যুদ্ধ নিয়ে যখন বিশ্ব পরিমণ্ডলে চিলকুটের প্রতিবেদন আলোচিত, তখন আমাদের দেশের সব আলোচনায় তা অনুপস্থিত! বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে যখন সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, আমাদের আলোচকরা তা উপেক্ষা করছেন বৈশ্বিক কিংবা জাতীয় গণমাধ্যমগুলোর সামনে। সন্ত্রাসের বিপণনে কিভাবে ইসলামে বিভিন্ন ধারার বিভেদকে কাজে লাগানো হচ্ছে, সেই আলোচনা সাদা কালি দিয়ে যেন কেউ মুছে দিয়ে গেছে। কোনো উদ্যত কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করছে না, কেন মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি? সর্বোপরি যে রাষ্ট্র, যে সরকার ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে, প্রশ্নকর্তারা সেই যন্ত্রেরই অংশ–এ কথা কি ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে?

ঘটনার পর একদিন সন্ধ্যায় প্রায় খালি একটি রেস্তোরাঁয় বসে অপেক্ষা করছি, গুলশান হত্যাকাণ্ডের পর নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে নিহত 'জঙ্গি'র (এখনো প্রমাণ হয়নি) বাসায় যাওয়ার জন্য। রেস্তোরাঁয় টিভিতে গুলশানের খবর দেখতে দেখতে বিরক্ত এক পরিবার চ্যানেল পাল্টে দিতে বলল। যতটুকু সহিংসতা বাকি ছিল আগের চ্যানেলে, তার চেয়ে বেশি নিয়ে হাজির হলো পরের চ্যানেলটি। সিনেমা দেখার জনপ্রিয় সেই চ্যানেলের বিষয়বস্তু তখন 'সুপার হিউম্যান' ও বিশ্ব বাঁচানোর লড়াই। এবার মাথা তুলে চাইল ওই পরিবারের ছোট সন্তানটি। মা-বাবা আর ভাই হারিয়ে গেলেন সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের আলোচনায় আর তার চোখ আটকে রইল বোকা বাক্সে।

মীর সামেহ মোবাশ্বের ২০ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে ১৮তম জন্মদিন পালন করেছিলেন মা-বাবার সাথে। ছোট ভাইয়ের সুকুমারবৃত্তি চর্চায় বড় ভাই তাঁকে কিনে দিয়েছিলেন একটি গিটার। কিন্তু ২৯ ফেব্রুয়ারি 'লিপ ইয়ার'-এর এই বিশেষ দিন থেকে নিরুদ্দেশ মোবাশ্বের। চুপচাপ স্বভাবের হলেও ধর্মের প্রতি আগ্রহ ছিল তাঁর। ছেলের খোঁজ পেতে মামলা-মোকদ্দমা থেকে শুরু করে হেন কাজ নেই করেননি মোবাশ্বেরের মা-বাবা। কিন্তু গুলশান ঘটনার পর টেলিভিশন আর পরিচিতজনদের কথায় জানতে পারেন, তাঁদের ছেলে এই ঘটনায় সম্পৃক্ত। অনেক কথার মাঝে মা-বাবার যে কথাটি কানে বাজে–'এটা আমার ছেলে নয়, আমার ছেলে মারা গেছে ২৯ ফেব্রুয়ারি।'

ফায়হাম ইবনে শরীফ: আলোকচিত্রী সাংবাদিক
ইমেইল:faiham1085@gmail.com